তারিখ 26 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে

এইচএসসির ফল | মধুমিতা চক্রবর্ত্তী

অধ্যক্ষ, সরকারি তোলারাম কলেজ
নারায়ণগঞ্জ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে ২৩ জুলাই রোববার। তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের বক্তব্য-বিবৃতি, ক্ষোভ-অসন্তোষ, আনন্দ-উল্লাস ধীরে ধীরে সামনে আসছে। কারও মতে, এই ফল এক ধরনের বিপর্যয়। কেউবা আবার বলতে চাইছেন খুব খারাপ কিছু হয়নি। ফল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মানুষ হওয়াটাই মুখ্য, ফলাফল নয়। খুবই প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তিসঙ্গত কথা। হরেদরে জিপিএ ৫ পেয়ে শিক্ষার্থীরা যেভাবে কৃতী গণ্য হচ্ছিল, তাতে করে ফলের ওপর ভরসা রাখা দুরূহ হয়ে উঠছিল। এবার বিভিন্ন বোর্ডের ফল পর্যালোচনা করে এক ধরনের ভারসাম্য চোখে পড়ে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ে। সারাদেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমেছে, বেড়েছে অকৃতকার্য হওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। যদিও সমসাময়িক এক-দুই বছরের ফল পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না, কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়।

যে প্রতিষ্ঠানগুলো গত বছর শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, তাদের অনেকেই (৩১৬টি) এবার তালিকা থেকে বাদ পড়ল কেন? কেউ পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গতবার ছিল ২৫টি, এবার কেন সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিনগুণ হয়ে গেল? এ বছরের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পাসের যোগ্যতা নিয়েই তো ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল; তবে অকৃতকার্য হলো কেন এত ব্যাপক হারে? এর দায়দায়িত্ব কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বহন করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিন্তু কোনোভাবেই এই বিপর্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মন্ত্রণালয় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসসহ অন্যান্য যুগোপযোগী পদক্ষেপের ব্যাপারে আদেশ-নির্দেশ অব্যাহত আছে। তবুও কেন প্রাতিষ্ঠানিক ভরাডুবি ঘটবে?

এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা বলার উপযুক্ত সময় এখনই। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মূলত দু'ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় শিক্ষার্থীদের। একটা সমস্যা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় সবাইকেই। যারা আত্মশক্তিতে বলীয়ান তারা উতরে যায়– যারা আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় তাদেরই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা যেমন অপ্রতুল, তেমনি অপর্যাপ্ত পাঠদান ব্যবস্থা। ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে ইচ্ছা করলেই পরিবর্তন আনা যায়, যেটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থেকে সরকারের অর্থনৈতিক সাধ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপ্রাণ চেষ্টা করে যা পারি না তাদের ক্ষেত্রে সেটা অনায়াস সাধ্য। তবু আধুনিক ব্যবস্থাপনার তেমন প্রসার ঘটেনি। পাঠদানের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু বলতে যাওয়া মানে আকাশের দিকে তাকিয়ে থুথু ফেলা। ২০১৫ সালে সর্বশেষ বেতন বৃদ্ধির যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে, শিক্ষকদের ওপর তার প্রভাব খুবই হতাশাব্যঞ্জক। প্রায় চার মাস পর বকেয়া বিল করতে বসে মধ্যরাতে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। মনে হয়, এক্ষুণি ছুটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম করে আসি। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন। কত বছর ধরে আমরা পড়েছিলাম একটা কৃত্রিম বেতন কাঠামোর মধ্যে! বাড়ি ভাড়া দিলে খাওয়ার খরচ থাকে না, পেট পুরে খেলে বস্তিতে থাকারও সংস্থান হয় না– এমন। সে ক্ষেত্রে প্রায় তিনগুণ বেতন বেড়ে যাওয়ার পর আমাদের তো নিশ্চিন্ত মনে পাঠদানে ব্যস্ত হয়ে ওঠা উচিত। অধ্যক্ষ হিসেবে নিজের এই উপলব্ধির কথা বারবার উচ্চারণ করি। বারবার মনে করিয়ে দিই শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, সুদূরপ্রসারী এক ব্রত। অনেকেই শুধরে ফেলেন নিজেকে, অনেকের কাছে পুনরুক্ত হিতোপদেশ অতি বিস্বাদ লাগে।

এবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান পাসের হার কমে যাওয়ায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বহুদিন ধরেই ধীরে ধীরে নিচে নামছে এই পরিসংখ্যান। বিজ্ঞান পড়া এখন এতটাই ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে যে, মধ্যবিত্ত এবং হতদরিদ্র ঘরের সন্তানরা বিজ্ঞান পড়া ছেড়েই দিচ্ছে প্রায়। প্রতিটি বিষয়ে প্রাইভেট পড়ার ধকলে মাসে সাত-আট হাজার টাকা বেরিয়ে যায়। তার ওপর আছে ব্যবহারিক পরীক্ষার ভোগান্তি। শিখবে এক জায়গায়, পরীক্ষা দেবে অন্য জায়গায়। অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে যেখানে যন্ত্রপাতিতে হাত দিতেই কাঁপুনি ওঠে।

ব্যবহারিক ক্লাসের বালাই থাকে না কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে। পরীক্ষার হলে এসে জীবনে প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। কম টাকায় প্রাইভেট পড়ার কাজ সারতে ছোটে কোচিং সেন্টারে। যেখানে পাঠদান করে বুয়েট, মেডিকেলে পড়া ছাত্ররা, কোনো শিক্ষক নন। এত ব্যয়বহুল আর কষ্টের পড়ার পরিণতি তা হলে কী হয়? আজকাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাবীন্দ্রিক একটা প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভর্তি হয়ে থাকে, ক্লাসে আসার নাম করে না। শিক্ষাজীবন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে নিজের বাড়ি আর কোচিং সেন্টারের মধ্যে। পরীক্ষার সময় এক রকম বাড়ি থেকে ডেকে আনতে হয় শিক্ষার্থীদের।

প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে আমি যে ব্যবস্থা নিচ্ছি, সেটাকেই সমস্যা সমাধানের পথ বলে ভাবি। ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বায়োমেট্রিক ডিভাইস তো রয়েছেই, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময় পরপর ফোন করা হয়। ক্লাসরুমে যেন ওদের মন বসে সে জন্য আধুনিকায়ন করা হচ্ছে রুমগুলোকে। বিশেষ করে পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া এবং মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। টানা সিডিউলে শ্রেণি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ করা হয় অধ্যায় সমাপ্ত পরীক্ষা। প্রতি শিক্ষক প্রতিটি অধ্যায় সমাপ্ত করার পর ক্লাসের সময় একটা পরীক্ষা নেবেন। ছয় মাস পরপর আয়োজন করা হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক মতবিনিময় সভা (যদিও অভিভাবকদের উপস্থিতি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক)। সার্বিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠানকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা চালু আছে, যাতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। আমি সুফল পাচ্ছি। উপস্থিতির হার বেড়েছে অকল্পনীয় মাত্রায়। বাকিটা পরবর্তী পরীক্ষার ফলে বোঝা যাবে।

ফল বিপর্যয়ে প্রতি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মূল কারণ প্রায় একই। আমি বারবারই প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার কথা বলব! তবে বিপর্যয়েরও প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীদের অন্তত এটুকু বিবেচনায় রাখা দরকার, পরীক্ষার আগে প্রশ্ন হাতে পেয়ে গেলেই ফল ভালো হয় না। ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত ফল। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। জিপিএ ৫ পাওয়ার থেকেও জরুরি ভালো মানুষ হয়ে ওঠা।